Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

বৈচিত্র্যময় সিলেটের সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা

কৃষ্ণা ভদ্র[১]*

[১]বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
* Corresponding Author: ড. কৃষ্ণা ভদ্র; ই-মেইল : dr.kbhadra2012@gmail.com; মোবাইল : +৮৮০১৩১১৪৫৬৪৪৮
Received: 16/04/2024; Accepted: 12/09/2024; Online available: 30/09/2024

সার-সংক্ষেপ

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, স্নিগ্ধ-মনোরমা বাংলাদেশ। সিলেট বিভাগ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এটি প্রশাসনিক অঞ্চল। প্রাচীনকালে এটি শ্রীহট্টের কেন্দ্রীয় প্রদেশ ছিল। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সিলেটকে 'শী-লি-চা-তোল' (Shili Tsa Tola) নামে এবং আলবেরুনীর 'কিতাবুল্ হিন্দ্' গ্রন্থে সিলেটকে 'সিলাহাত'নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ের একসময়ের রাজা গুহকের কন্যা শীলার নামে সিলেটকে 'শীলা-হাট' বলা হতো। আবার সিলেটে প্রচুর পাথর (শিলা) থাকায় এর নামকরণ হয় 'শিলাহট্ট' অপরদিকে পশ্চিম ভাগ তাম্রলিপিতে (দশম শতক) সিলেটকে 'শ্রীহট্টমণ্ডল' বলা হয়েছে। তারপরে হজরত শাহজালালের (রঃ) সময়ে 'শিলাহট্ট' বলা হতো। পরে সিলেটের নাম 'জালালাবাদ' হয়ে যায়। এ ছাড়াও ৩৬০ আউলিয়ার দেশ নামে পরিচিতি পায়। এ ভূখণ্ডটির ইতিহাসের আলোকে লিপির ব্যবহার, শব্দভাণ্ডার, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সুসজ্জিত ছিল। আজও এতে তাম্রফলক, আদিবাসী সম্প্রদায়, পাহাড়, নদীর মনোমুগ্ধতা সাহিত্য ও কৃষ্টিকে অনন্য করে রেখেছে। এখনো বাংলাদেশের ভাষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বহুভাষা, বহুধর্ম-বর্ণ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবিকায়ন পদ্ধতির মিশ্রণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে হলে সিলেটকেই খুঁজতে হয়। সিলেটের ভাষা আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে পরগণিত হয়। সকল আঞ্চলিক ভাষা ও মাগধী প্রাকৃত ভাষার সমন্বয়েই বাংলা ভাষা এগিয়ে চলছে। সর্বোপরি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠেছে আমাদের আশা ও উদ্দীপনার প্রদীপ। বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষার তালিকায় বাংলা ভাষার স্থান আজ সপ্তম। বাংলা ভাষা সাহিত্যের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর সমন্বয় রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। যে ভাষার সম্মান রক্ষায় ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি। আজ বিশ্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। বাংলা ভাষা প্রচলনে অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন দিকসমূহ ও প্রমিত বাংলা সর্বস্তরে চালু করা অর্থাৎ 'ভূমি-মানুষ-ভাষা'– এই তিনটি বিষয় এবং ভাষার শ্রেণি অভ্যুদয় (সমৃদ্ধি) চিত্র রূপায়ণ এই প্রবন্ধের অন্বেষণ।

মূল শব্দ সূচক : সিল্‌টিভাষা, নাগরীলিপি, তাম্রফলক, আদিবাসী, বাংলা ভাষা

ভূমিকা

পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩৪৫) বলেছেন, "শ্রীহট্ট পরিক্রমা না করা পর্যন্ত আমার ভারত পরিক্রমা শেষ হলো বলে মনে করি না।' এই মহান পর্যটকের সিলেট অঞ্চলে অধিক সমাদৃত। বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই প্রমিত বাংলা কারো মাতৃভাষা নয়। সকলের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক রূপ। আঞ্চলিক বাংলার যত রূপ এবং বৈচিত্র্য রয়েছে সেসবের মধ্যে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট) সর্বাপ্রেক্ষা দুরূহ। সিলেটের এই ভূখণ্ডটির প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে অবাক হতে হয়। সিলেটি ভাষার বৈচিত্র্য ও শব্দভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করতে হলে সুদীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বয়ই সিলেটে বিদ্যমান। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেটে সুরমা-কুশিয়ারা,সারী-মনু-খোয়াই নদ-নদী, বিধৌত হজরত শাহজালাল (রঃ), হজরত শাহপরাণ (রঃ) এবং মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবসহ বহু জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর একদা স্মৃতি বিজড়িত আবাসভূমি ছিল। সর্বশেষ ভূমি-জরিপ অনুসারে বৃহত্তর সিলেটের আয়তন ছিল ৪৭৮৫ বর্গমাইল। খাসিয়াদের রাজত্বকাল থেকে এখন পর্যন্ত খাসিয়ারা সিলেটকে 'সিলত্' নামে অভিহিত করে আসছেন। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সিলেটকে 'শী-লি-চা-তোল' (Shili Tsa Tola) নামে এবং বিখ্যাত আলবেরুনীর '*কিতাবুল্ হিন্দ্*' গ্রন্থে সিলেটকে 'সিলাহাত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ের একসময়ের রাজা গুহকের কন্যা শীলার নামে সিলেটকে 'শীলা-হাট' এবং সিলেটে প্রচুর পাথর (শিলা) থাকায় এর নামকরণ হয় 'শিলাহট্ট' বা 'শীলহট্ট', অপরদিকে পশ্চিম ভাগ তাম্রলিপিতে (দশম শতক) সিলেটকে 'শ্রীহট্টমণ্ডল' বলা হয়েছে। তারপরে হজরত শাহজালালের (রঃ) সময়ে 'শিল হট' বলা হতো পরে সিলেটের নাম 'জালালাবাদ' হয়ে যায়। এছাড়াও 'কসবে সিলেট' এবং '৩৬০ আউলিয়ার দেশ' নামে পরিচিতি পায়। ইংরেজিতে সিলেটকে 'সিলেট' (Sylhet) এবং সিলেটের ভাষায় সিলেটকে 'সিলট' বা ছিলট নামে ডাকা হয়।

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

পৌরাণিক তথা মহাভারতের সময়ে কালে বৃহত্তর সিলেটকে 'পুণ্যভূমি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এসময়ই এখানে কামরূপরাজ্য, 'প্রাগ্জ্যোতিষ' (আসামের আদি নাম) শব্দটি অস্ট্রিক (খাসিয়া) "পাগর + জুহ" (পাগারজু) হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'উচুঁ পাহাড়ের দেশ'। বায়ুপুরাণে প্রাগ্জ্যোতিষ, 'ত্রিপুরা', ও 'কিরাত' দেশের উল্লেখ আছে। বরাহ মিহির রচিত সংহিতায়, খাস, ত্রিপুর ও নারীদেশ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় – প্রাচীন জৈন্তা রাজ্যই মূলত ছিল নারীদেশ। মহাভারতের যুগে সিলেট ভূমি কামরূপের অংশ ছিল। ভগদত্ত ছিলেন তৎকালীন রাজা। আসাম বুরুঞ্জীমতে সিলেটের লাউড় পাহাড়ে তাঁর একটি দূরবর্তী রাজধানীও ছিল। বর্তমানে লাউড় পাহাড়ে রাজা ভগদত্তের বাড়ি নামে নামডাক রয়েছে। মূল রাজধানী ছিল প্রাগ্জ্যোতিষপুর। ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে – প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য। তিনি সকল সৈন্যসহ ইতিহাস বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে *'জৈমিনী ভারত'* গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পৌরাণিক যুগে জৈন্তাকে নারীরাজ্য বলা হতো। এই নারীরাজ্যে ও অধিশ্বরী ছিলেন এক বীর রমণী প্রমীলা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর নানা ঘাত প্রতিঘাত ও ঘটনার পর মহাবীর অর্জুন বীরাঙ্গনা প্রমীলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রাচীনকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত পাণিনি তাঁর *'অষ্টাধ্যায়ী'*-তে প্রাচ্য জনপদের মধ্যে মগধ, অবন্তীর সঙ্গে 'সুরমস' নামক একটি জনপদের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে বৃহত্তর সিলেট জেলা প্রাচীন 'জৈন্তা' রাজ্যের অধীন (অংশ) ছিল। বিশেষ করে সিলেট সদর সাবডিভিশন, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, সুনামগঞ্জ সাবডিভিশন এবং মৌলভীবজার ও হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের কিয়দংশ বর্তমান ভারতের করিমগঞ্জ জেলার অর্ধাংশ এবং উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ ছিল তাদের অধিভুক্ত। জৈন্তা রাজ্যের অধীনে থাকা অবস্থায়ই মাঝে মধ্যে 'ত্রিপুরার' রাজারা সমগ্র সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের অংশ বিশেষের তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কুশিশ করতেন। এই সময়কালের মধ্যেই বৃহত্তর সিলেটকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো – 'জৈন্তা', 'লাউড়' ও 'গৌড়' নামে বহুল পরিচিত রাজ্যসমূহ। পরে কিছুকাল এই তিন রাজ্যকে ত্রিপুরার এবং জৈন্তাার রাজারা উত্তর ও দক্ষিণ অংশ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে শাসন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে (৭ম খ্রিঃ) কামরূপের মহারাজা 'ভাস্কর বর্মণ' সিলেট শাসন করেন। তারপর কামরূপের পরবর্তী রাজা 'কামসিন্ধু' মৃত্যুর পর তার পত্মী 'উমরি রাণী'র কন্যাকে রাজপুত্র 'কুশক' বিবাহ করেন। তাদেরই এক সন্তানের নাম ছিল 'হটক'। এই সময় এই সাম্রাজ্যের নাম ছিল 'কৃশক' সাম্রাজ্য। হটক থেকে শুরু করে 'গোবিন্দরানা কেশব দেব'সহ মোট নয়জন রাজা ছিলেন। দশম শতাব্দী (১০তম শতক) পর্যন্ত এরা শাসন করেন। আনুমানিক এগারো শতকে গোবিন্দ কেশব দেব ক্ষমতায় আসেন। 'হটক'-এর সন্তান 'গুহক' রাজ্য ক্ষমতায় বসেন। রাজা গুহকের তিন ছেলে এবং দুই কন্যা ছিল। ছেলেদের নাম ছিল 'লুদ্দক', 'গুররুক' ও 'জৈন্তাক' এবং কন্যাদের নাম ছিল 'শিলা' ও 'চটালা'। রাজকন্যা শিলার রাজধানীর নাম হয় 'শিলাহট্ট'। এই সময় রাজা 'গুহক' তার তিন পুত্র 'লদ্দুক' 'গুররুক' ও 'জৈন্তাক'কে সাম্রাজ্যের তিন অংশ ভাগ করে দেন। পরবর্তীতে 'লুদ্দকে'র অংশের নাম হয় 'লাউড়' আর গুররুকের অংশের নাম হয় 'গৌড়' এবং 'জৈন্তাকে'র অংশের নাম হয় 'জৈন্তিয়া'। ইতিহাসের এই তিনটি রাজ্য মিলেই বৃহত্তর সিলেট জেলা গঠিত হয়েছিল। 'চার হাজার বছর পূর্বে *মহাভারত* গ্রন্থে 'খাস' বলে একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাসিয়া শব্দটি 'খাসি' শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। সমস্ত খাসিয়া জাতিকে বোঝাতে 'খাসি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একাদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু আর্যরা বিকৃত করে 'খাইই' বা 'খাই' বলে ডাকতো। সম্ভবত সে সময়ে সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল 'খাইরিয়েম' রাজার অধীনে থাকায় এ অঞ্চলের খাসিদেরকে হিন্দুরা 'খাইই' বলেও সম্বোধন করতো। 'খাই' শব্দটি পরবর্তীতে 'খাসিয়া' শব্দে রূপান্তরিত হয়। খাসিয়ারা পাহাড়ে ও স্থলভাগে বসবাস করে থাকেন। পাহাড়ে যারা থাকেন তাদেরকে 'রিউলুম' বলে। আবার একত্রিতভাবে উভয় স্থানের খাসিয়াদেরকে সপ্তকটু বা হেননিউস্কুম হেননিউ ট্রেপ নামে অভিহিত করা হয়। খাসিয়াদের মধ্যে আঞ্চলিক প্রভাবও রয়েছে যেমন :

* মেঘালয়ের পূর্বাঞ্চলের খাসিয়ারা 'জয়ন্তিকা বা প্লার'
* সিলেট সংলগ্ন পাহাড়ী খাসিয়ারা 'ওয়ার'
* পশ্চিমাঞ্চলের খাসিয়ারা 'লাঙাং'
* মধ্যমাঞ্চলের খাসিয়ারা 'খেনরিয়াম', এবং
* আসাম সংলগ্ন খাসিয়ারা "ভয়" নামে পরিচিত।"[১]

সিলেট ও বাংলাদেশের বসবাসকারী খাসিয়ারা 'ওয়ার' ও 'প্লার' গোত্রের। প্রধানত মিয়ানমার (বার্মা), আসাম, মনিপুর, নাগল্যান্ড, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে অল্প সংখ্যক খাসিয়াদের বসবাস রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, জাফলং, লংলা পাহাড়, সাতগাঁও পাহাড়, বরমচাল, বড়লেখা, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, বাহুবল, চুনারুঘাট ও সুনামগঞ্জে হাজার হাজার খাসিয়ারা বসবাস করে আসছেন। তাদের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষা ইত্যাদির শেকড় কিন্তু অনেক দূর বিস্তৃত ও সুগভীরে প্রোথিত। সিলেটের জাতিসত্ত্বা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় ১৬ কোটি (মতান্তরে ১২ কোটি) অধিবাসীর মধ্যে ৯৮ শতাংশ বাঙালি এবং ২ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোত্রজ নৃ-গোষ্ঠী। এদের অনেকে

প্রধানত মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর শ্রেণিভুক্ত। অন্যদিকে বাংলা ভূখণ্ডের (বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা) বিশাল বাঙালী একটি মিশ্র রক্ত বা সংকর নৃ-গোষ্ঠী।"[২]

বৃহত্তর সিলেটের বিচিত্রতা

হাজার বছর থেকেই বাংলাদেশ তথা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল বহুভাষা ভিত্তিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীনকালে গণ মানুষের ভাষাই প্রথম ভাষা। এরপর আদি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা যুক্ত হতে থাকে বৃহত্তর সিলেটের ভাষায়। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ আদির্শপা, সপ্তম শতকে কামরূপ রাজ ভূতির্বমা সময়ে সমাজে সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষার প্রচলন ঘটে। অপরদিকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০০ বছর এই দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের যুগ। এই সময় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের লিখিত চর্যাপদের ভাষা ও বৃহত্তর সিলেটের গ্রাম্য ও গণমুখের ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। তাই পণ্ডিত মথুরনাথ চৌধুরী বলেন, "সিলেটের প্রাচীন গ্রামের ভাষা অনেকটা বৌদ্ধ পালি মিশ্রিতভাষা, উহা আজও বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত হতে পারে নাই। চৌদ্দ শতকে হযরত শাহজালাল (রঃ) সহ ৩৬০ আইলিয়ার মাধ্যমে সরাসরি আরবী ভাষার শক্তভিত তৈরি হয়। বাংলায় সিলেটি ভাষাকে সিলটি ভাষা (ছিলটী বাত) বলা হয়। আর এই ভাষার বর্ণমালা বা লিপিকে 'ছিলট নাগরী হরফ', 'দেব নাগরী' রূপান্তরিত হয়ে 'সিলটি নাগরী', মোহাম্মদী নাগরী' 'নাগরাক্ষর', নাগরলিপি' 'মুসলমানী দেবনাগরী' ইত্যাদি নানা নামে ডাকা হয়। যদিও মুখে মুখে সিলেটী ভাষার আজও কথিত সত্ত্বেও লিখিত রূপ বিকাশ লাভ হয়নি।" উল্লেখ্য যে, সিলটি ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য দিক থেকে সিলেটের ভাষার ঘটে ব্যাপক ভাষা বিন্যাস। প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক যুগের সূচনা থেকেই বৃটিশদের মতো আসতে থাকে পর্তুগিজ, দিনেমার, চীনা, ইংরেজি ভাষা ও তার শব্দভাণ্ডার। আর ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্থানে উর্দু ভাষা সিলেটি ভাষায় মিশতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর সময় থেকে এখন পর্যন্ত সিলেটি ভাষার চলমান রয়েছে হিন্দি ভাষা ও তার শব্দসমূহের অনুপ্রবেশ। এভাবেই পর্যায়ক্রমে এবং কালে কালে বৃহত্তর সিলেট একটি বহুজাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক অঞ্চল হিসেবে মহীরূহে পরিণত হয়।"[৩]

সিলেটি ভাষায় সাহিত্য সম্ভার

পাঁচশত বৎসর ধরে বৃহত্তর সিলেটে আরবি, সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজিসহ ভাষার প্রচলনের পাশাপাশি অনেক সুনাম ধন্য ও সাহসী লেখকগণ আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য জীবনী গ্রন্থ, গল্প, কবিতা, গীতিকা, ধর্মীয়, সুফি, পুঁথি ও আধুনিক সাহিত্য রচনায় মাধ্যমে সৃজনশীলতার বহুমাত্রিকা পরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন। সাহিত্য সম্ভারগুলো হলো যথাক্রমে – নাথগীতি (কদলীপা, চতুর্দশ শতক), সঞ্জয় লাউড় (পঞ্চদশ শতক), কবি শেখ চান্দ (ষোড়শ শতক), পাগল ঠাকুর (সপ্তদশ), হৃদয়ানন্দ ষষ্ঠীবর দত্ত (সপ্তদশ), সৈয়দ শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৫), মুরারী গুপ্ত (পঞ্চদশ শতক), ঈশান নাগর (ষোড়শ শতক), সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), শাহ আব্দুর ওহাব (১৭৬৩-১৮৮৮), সুফী শিতালং (১৮০০-১৮৮৯), মুন্সি সাদিক আলী (১৮০১-১৮৭৫), রাধারমন দত্ত (১৮৩৩-১৯০৭), ইব্রাহিম তশনা (১৮৭০-১৯৩০), জয়নাথ নন্দী মজুমদার (১৮৬৩-১৯৪২), আব্দুল আজিজ (১৮৯৩-১৯৬০), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), আব্দুল গফুর খাঁ (১৯১৬-১৯৭৮), এ এইচ ফয়েজুল হাসান (১৯২৩-২০০১) ফজলুর রহমান (১৯২৩-২০০১) প্রমুখ। তাঁদের অষ্টাদশ ও আধুনিক যুগের কয়েকজনের অনবদ্য সাহিত্যকর্ম উপস্থাপিত হলো :

'সুফী শিতালং (১৮০০-১৯৮৯) উনিশ শতককে শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে সিলেট ও কাছাড় জেলার (ভারতের) ঘরে ঘরে যাঁর গানে মুখরিত থাকতো সেই প্রখ্যাত মরমী সংগীতকার মোহাম্মদ সেলিম ওরফে সুফী শিতালং শাহের জন্ম চাপাট পরগনার শ্রী গৌরী গ্রামে। শোনা যায়, তিনি সিদ্ধি লাভের জন্য লাউড় ও ভুবন পাহাড়ের নির্জন স্থানে বারো বছরব্যাপী স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত রচনার মধ্যে *মুশকিল তরান*, *কিয়ামত নামা*, *রাগ বাউলা* উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতা ও গানে তাঁর মনের ভাব অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। একটি নমুনা স্বরূপ –

'তিশ' হরফে কোরান শরীফ রচিয়াছে সাঁই
'তিশ' হরফে আদম ছবি রাখিয়াছে বানাই।
'আলিফ' হরফ দিয়া নাক বানাইয়া
'বে' হরফে চক্ষু বানায় সাহেব বিনোদিয়া
'তে' হরফে তালু বানায় আল্লা নিরঞ্জন
'ছে' হরফে হইল জান মুখের গঠন।

'জিম' হরফে জি পয়দা করে পাকজাত
'হে' হরফে হাড় পয়দা কুদরতির সাথ।'

তেমনি রাধারমন দত্ত (১৮৩৩-১৯০৭)

সুনামগঞ্জ জেলার কেশবপুরে রাধারমন দত্তের জন্ম। তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। একসময় তিনি স্ত্রী-পুত্র সংসার ত্যাগ করে হাওরের পাশে আশ্রম নিমার্ণ করে সহস্রাধিক বাউল সংগীত রচনায় ব্রতী হন। তাঁর সঙ্গীতের পরিধি অনেক ব্যাপক ছিল সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ। এই অঞ্চল গুলোতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ছিলটি (সিলেটের) ভাষার বাউল সংগীতের উদাহরণ দেয়া হলো :

"প্রাণবন্ধু কালিয়া আইল না শ্যাম কি দোষ জানিয়া,
ও বড় লজ্জা পাইলাম নিকুঞ্জে আসিয়া।। ধুয়া।।
প্রাণবন্ধু আসবে করি, দোয়ারে না দিলঅম দড়ি,
ওগো আইল না শ্যাম নিশি যায় পোহাইয়া।
বুঝি কোন রমনীয়ে পাইয়া, রাখিয়াছে শ্যাম ভুলাইয়া,
এগো রহিয়াছে শ্যাম, আমারে ভুলিয়া।
গাঁথিয়া বন ফুলের মালা, মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা,
ও মালা দিতাম নিয়া জলেতে ভাসাইয়া
মনে বড়ই আশা করি, আইলনা শ্যাম বংশিধারী;
রাখতাম চূয়া চন্দন কটরায় ভরিয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে রাধার প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে,
দুইটি নয়ন জলে, বুকত যায় ভাসিয়া।"

সিলেটের হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে একজন যাঁর লেখার ভাণ্ডার আকাশ স্পর্শ করে। তিনি হলেন ফজলুর রহমান (১৯২৩-২০০১)। তাঁর সৃষ্টি সিলেটের তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তেমনি একটি লিখা 'বাংলাদেশ' –

"নয় মাস ধরে রক্তসাগরে সিনান করিয়া শেষ
সবুজ রোহিত থাকা শোভিত আসিল বাংলাদেশ
পঁচিশে মার্চ যে যাত্রা শুরু ষোল ডিসেম্বর সারা –
বেদনা-বিধুর কন্টক ঘেরা দুযোর্গময় কারা –
বাঙ্গালী ভীতু বাঙ্গালী ভীরু মিথ্যা ও অপবাদ
বাংলার ছেলে ঘুচায়ে দিয়েছে, মিটায়ে যুদ্ধ সাধ।"[৪]

গীতিময় সিলেট

গীতিময়তা ও চিত্রলতার যে প্যানোরামি সিনারিও বৃহত্তর সিলেটে দৃশ্যমান হয় সেটি আর কোথাও হয় না। শতাধিক বছরের প্রাচীনতা নিয়ে বহুমুখী গানসমূহ বংশপরম্পরায় দৃপ্তভাবে অনবদ্য। সকলের মনের মুকুরে জানান দিচ্ছে গীতিময় অস্তিত্ব। বারমাসীগীত বা লাছাড়ি গান, ছাইয়া (ছড়া), দৃষ্টান্ত, দই (ছোট ছোট পদ্য), বাউল গান, মারফতি গান, প্রবাদ, কথার কথা (কথার সংগে যে কথা আসে), ধামালি (ধামাইল, ডোরা ধুরা) গান, সারি গান, গাজির গান, জারি গান, হাজিরাত গান, ঘাটু গান, উলী গান, (হোলী বা দোল গান), দুঃখের গান, পাঁকি কথা (ঠেকান কথা), মুর্ছিয়া গান (মর্সিয়া), বানধা গান, হেঁয়ালি শ্লোক, চুটকি গান, ভারত (বিচরণ) গান, ভাঙ্গানি শিল্লক, বয়ান (বর্ণনা), রংচং, আউল কথা (একটা পদ আবৃত্তি করতে করতে কথা এলোমেলো বা আউলা ঝাউলা হয়ে পড়ে),প্যাচের কথা (ঠিন উত্তর, চিন্তাপূর্ণ বাক্যাবলী), টক্কর কথা (উত্তরদানে প্রার্থীকে প্রার্থনায় বঞ্চিত করা), ইশারা কথা (ইঙ্গিত বিষয় প্রকাশ প্যাচের কথা), হেঁয়ালি অঙ্গ বা হিসা (কঠিন স্তরের চিন্তাযুক্ত হিসাব) লোক গল্প বা চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক গল্প, ভাট কবিতা (ভট্টকাব্য), জন সাহিত্য, (মোট ৩৭টি) ইত্যাদি।"[৩]

দেওয়ান হাসন রাজা

(১৮৫৪ -১৯২২: লক্ষণ ছিরি)
লোকে বলে, লোকে বলেরে, ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার।
কি ঘর বানাইর আমি শূন্যের মাঝার ॥
ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।

বিয়ের গান

আইলারে নয়া দামান্দ আসমানেরো তেরা
বিছানা বিছাইয়া দেব শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বত্ত, দামান্দ বত্ত।"[৫]

উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা

ভাষা হলো মানুষের বাকযন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম। ভাষা ধ্বনি যুক্ত অর্থবহ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত সঠিক বাক্য। বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষাই হলো আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। যে ভাষা শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে শেখে, যার লিখিত কোন ব্যাকরণ নাই, যে ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের উচ্চারণ দোষে যে নানা রকম ভুল থাকে অর্থাৎ যে-কোনো রকমের ধ্বনি হলেই ভাষা হবে না। যেমন – হাততালি দিয়ে ইশারায় কথা বলা ভাষা নয়। যা কেবল আবার উচ্চারণ যোগ্য ধ্বনি হলেই তা ভাষা হবে না। তাকে হতে হবে অর্থবহ। অর্থবহ শুধুমাত্র মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী ধ্বনিই হল ভাষা। ভাষা ও উপভাষা মধ্যে কিছু মিল থাকলে ও এদের মধ্যে বেশ কিছু অমিল ও রয়েছে। নিচে ভাষা ও উপভাষা মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো :

- যে ধ্বনি মানুষের বাক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত এবং যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে ভাষা বলে। অন্যদিকে বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত কোন ভাষা অঞ্চল ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, ভাষার সেই আঞ্চলিক রূপভেদগুলিকে উপভাষা বলে।
- ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত। অন্যদিকে উপভাষা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত।
- ভাষার একটি সার্বজনীন আদর্শ রূপ আছে। অন্যদিকে উপভাষা সেই আদর্শ রূপ অঞ্চলভেদে।
- ভাষায় রচিত হয় সাহিত্য কীর্তি। অন্যদিকে উপভাষায় রচিত হয় লোকগীতি ও লোকসংগীত।
- ভাষার নির্দিষ্ট ব্যাকরণ থাকে। অন্যদিকে উপভাষার নির্দিষ্ট কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ থাকে না।

বাংলা ভাষা

পৃথিবীর ভাষাগুলির নির্ধারণে পৃথিবীর সকল ভাষাই অনেক ধাপ পেরিয়ে স্বাতন্ত্রিক ভাষায় আত্নপ্রকাশ করে। তেমনি বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা গোষ্টীর অন্তর্ভুক্ত। তেমনি মিশ্রজাতি বাঙালির ভাষা ও দুইশত বৎসর ধরে পুরাতন প্রাচ্যক্রম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নানা রূপ নিয়েছে যেমন – মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত, গৌড়ীয় প্রাকৃত। এই ভাষা সময়ের সাথে আরো পরিবর্তিত হতে থাকে – গৌড়ীয় অপভ্রংশ (৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দে); এই বংশেরই সন্তান বিহারি, পুরোনো ওড়িয়া ও বঙ্গকামরূপী (৫০০ খ্রিস্টাব্দ) আর এই বঙ্গকামরূপী হলো অসমিয়াও বাংলা ভাষার জননী। প্রকৃত পক্ষে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অসমিয়া ও বাংলা – এই দুই ভাষার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। বাংলা মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকেই উৎপত্তি হয়। এদিকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রফিক, সালাম, বরকত সহ নাম না জানা অনেকেই শহীদ হন। এরই সূত্র ধরে ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগে নতুন দেশ 'বাংলাদেশ' স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, স্বাধীনতা লাভ করা। ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো কতৃর্ক ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার তিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ সকল শহীদদের আত্মত্যাগে আজ বাংলাদেশ। বলা অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হওয়া সময়ের দাবী। তা বাস্তবায়ন হচ্ছে ধীরগতিতে। এক্ষেত্রে গবেষণার অগ্রগতির দিকগুলে হলো :

- বাঙালি জাতি আবেগীয় জাতি। মহত্ব অতুলনীয়। ১৯৫২ সালে টগবগে তরুণেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষা করেছেন। সেই বীর শহীদদের জীবনকে দেশের তরে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। এখনও বাংলা সর্বস্তরে চালু না হওয়াটার জন্য মহান পৃষ্ঠপোষকগণের উদাসীনতা অন্যতম একটি কারণ।

- রাষ্ট্র সরকার এ বিষয় নিয়ে তৎপর হতে হবে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা অব্যাহত রেখেছেন। তাই এখন জাতিসংঘে বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার আরো প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
- গত দুইশতকে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বেড়েছে। শাসন ব্যবস্থা রায়গুলো বাংলায় হলে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বেড়ে যেতো অনেকগুণ। ফলে সুশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পেতো।
- মাতৃভাষায় বাংলা বিশ্বের সপ্তমতম বৃহত্তম ভাষা। জনসংখ্যা বিশ্বব্যাপি প্রায় ২৬ কোটি। তথাপি তা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হতে পারেনি।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন –

“৩৬০ ওলির পদশ্রীভুমি, আরব তুল্যমাটি,
ধন-সম্পদ খ্যাতিতে তাই সিলেটরাই খাঁটি।
মাটির বাঁধন, শক্ত বাঁধন, মাতৃভূমির টানে
সিলেটিরা সিলেঠ প্রেমিক, দেশ বিদেশ জানে।”[৬]

আঞ্চলিক ভাষা সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ভাষা নয়, আঞ্চলিক সাহিত্য ও তাই। বৃহত্তর সিলেটের ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জনসৌধ সংগঠিত আছে। সর্বেপরি লাইভলিহুড বা জীবিকায়নের চর্চায় সকল জনগোষ্ঠীরই অংশদারিত্ব রয়েছে। তাইতো বহু ভাষা, বহুবংশ, বর্ণ- সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবিকায়ন পদ্ধতি মিশ্রণ সর্ম্পকে জানতে হলে সিলেটকেই খুঁজতে হয়। তথাপি বিশিষ্ট পন্ডিত রামনিধি গুপ্ত বলেছেন –

“নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুষে কি আশা
কতো নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা।”[৭]

আবার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বঙ্গভাষা কবিতায় বলেছেন –

“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজনু বিফল তপে অরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে –
‘ওরে বাছা, মাতৃকোষেরতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।”[৮]

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ থেকে ২০২৪ সাত দশকের বেশী একটি সাহিত্যের ধারা নির্মাণের জন্য বেশী সময় নয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতি এগিয়েছে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হতে হলে প্রচুর অর্থায়ন দরকার। কথিত সেই অসুবিধা জনগণের সংকল্প দ্বারাই

সাফল্যের দিকে বাস্তবায়িত হবে। এমন দিকগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তা যদি সহস্র লক্ষ হয়, তবু জনগণের একত্রে যে-কোনো সমস্যা সমাধান ও তা বাস্তবায়ন সম্ভব। যা বাংলাভাষাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ প্রত্যাশা আপামর বাংলাদেশের জনগণের। মা ও মাতৃভূমি যেমন সবচেয়ে প্রিয়, তেমনি মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশি ভাষা ও প্রত্যেকের সমান প্রিয়। প্রত্যেক জাতির কাছেই তার মাতৃভাষা মহামূল্যবান।

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা বাংলা হতে হলে অর্থায়ন দরকার। তাই সরকারকে বাংলা সর্বস্তরে চালু করার জন্য আরো শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে এবং বাংলাদেশের জনগণ দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হতে হবে।

তথ্য সূত্র

১. মালিক আনোয়ার (২০১৩) সিলেটঃ ভাষা বৈচিত্র্য ও শব্দ সম্পদ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ২১-৩০।
২. তদেব,পৃ. ২৯-৫৫।
৩. তদেব,পৃ. ৯৫-১১৭।
৪. তদেব, পৃ. ১২৬ ।
৫. তদেব, পৃ. ১২৭
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩৬), 'শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথঃ শতবর্ষে স্মরণোৎসব, 'শ্রী ভূমিকবিতা' ৮ মে ২০২১।
৭. ডাঃ সাঈদ হায়দার (২০০৯), বাংলা ভাষা, সাহিত্য নিদর্শন এবং ঢাকা, পৃ. ৫৩।
৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৬৬), চতুর্দশীপদী কবিতাবলী গ্রন্থ, কলিকাতা পৃ. ১০।